

শ্রীরামকৃষ্ণ

এম এল দে এণ্ড কোং
১৩-১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা



বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন। রাত্রি শেষ হতে তখনও অর্দ্ধদণ্ড বাকি ; এমন সময় এক অন্ধকার চালাঘরে জন্মালেন—এক শিশু। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সদ্য যে ছেলে জন্ম নিল, সে যেন দেখ্‌তে ছ'মাসের ছেলে। যেমন রং, তেমনি স্বাস্থ্য।

ক্রমে দিনের আলো দেখা দিল। আশে-পাশের প্রতিবেশিনীরা একে একে সবাই এলো ছেলে দেখতে। সারা পাড়া শাঁখের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। এই নবাগত শিশুই হলেন—আমাদের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব। এঁর মাতার নাম চন্দ্রা দেবী আর পিতার নাম ক্ষুদিরাম। এঁরা ছিলেন রামের উপাসক। এঁদের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। অবস্থা এঁদের ভালো ছিল না। ক্ষুদিরাম যাজকতা করে যা সামান্য কিছু পেতেন, তা দিয়েই কোন রকমে ছোট সংসার চলে যেত। সুখে-দুঃখে এঁরা রামকেই স্মরণ করতেন। রামই ছিলেন এঁদের সকল সময়ের সাথী।

ক্ষুদিরাম ছিলেন সত্যবাদী, ভুলেও কখন মিথ্যা কথা বলতেন না। তাই গাঁয়ের সকল লোকই তাঁকে করতো শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

একদিন গ্রামের জমিদার তাঁকে বললেন—কোন এক প্রজার বিরুদ্ধে তাঁর হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে। ঠাকুর রাজী হলেন না। ফলে তাঁর বিষয় সম্পত্তি সবই গেল ক্রুদ্ধ জমিদারের গ্রাসে। সবকিছু একে একে জমিদারকে ছেড়ে দিয়ে, গৃহহারা হয়ে ঠাকুর ছুটলেন একটু আশ্রয়ের আশায়।

কামারপুকুর গ্রাম। সোনার বাংলার হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ছায়ায় ঢাকা একখানি ছোট গাঁ কামারপুকুর। এখানে এসে উঠলেন—ঠাকুর ও ঠাকরুণ।

সুখলাল গোঁসাই এখানে বাস করতেন। তাঁর নাম-ডাক ছিল খুব। তিনি আশ্রয় দিলেন ঠাকুর ও ঠাকরুণকে। তাঁরাও দুঃখের নীড় তৈরী করে এখানে বাস করতে লাগলেন। এখানেই জন্মালেন আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। এ ঘটনা হলো একশ' সতের বছর আগের।

দেখতে দেখতে আট মাস গেল কেটে! এবার শিশুর অন্নপ্রাশন আর নামকরণ। বাড়ির সবাই অবশ্য ইতিমধ্যেই তাঁর নাম রেখেছেন গদাই বা গদাধর। এবার তাঁর সত্যিকারের নাম রাখা হবে। তাঁর দুই দাদা। প্রথম রামকুমার আর দ্বিতীয় রামেশ্বর। শুধু তাঁর নাম হবে গদাধর! সে হতে পারে না। তাই ভাত মুখে দেওয়ার দিন তাঁর নাম রাখা হলো—রামকৃষ্ণ।

দিনের পর দিন তিনি বড় হতে লাগলেন। তাঁর দেহের সৌন্দর্য্য ছিটকে পড়তে থাকে! সকলেই তাঁকে দেখে হাঁ করে থাকেন। তাঁদের মন যেন বলে,—এ ছেলে মানুষ নয়, দেবতা। মানুষের দেহে কি এমন স্বর্গীয় রূপ সম্ভব? গদাধরের পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি হলো ধুমধাম করে। তারপর তাঁকে পাঠান হলো গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে।

কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মন বসলো না। ভেসে বেড়ায় সারা জগতে তাঁর চোখ দুটো। অ, আ, ক, খ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। ঠাকুরের মন যেন সর্ব্বদাই কোন এক অজানার সন্ধানে ফিরছে।

দেখতে দেখতে তাঁর বয়স হলো নয়। জাক-জমক করেই ক্ষুদিরাম তাঁর পৈতে দিলেন।

আটষট্টি বৎসর বয়সে ক্ষুদিরাম ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর বড় ছেলে রামকুমারকে সঙ্গে করে গেলেন সেলামপুরে, তাঁর ভাগ্‌নে রামচাঁদের বাড়ি। তখন শরৎকাল। সামনে দুর্গাপূজা। পূজার মধ্যে তাঁর অসুখ বেড়ে গেলো। বিজয়ার পর তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে সংসারের মায়া ত্যাগ করলেন। গদাধর হলেন পিতৃহারা।

গদাধরের বয়স হলো চোদ্দ। কিন্তু লেখাপড়া তাঁর কিছু হলো না। বড়দা রামকুমার ছোট ভাইয়ের জন্য হলেন চিন্তিত। তিনি তাঁকে সঙ্গে করে কলকাতায় ঝামাপুকুরে আনলেন। এখানে তিনি একটা টোল খুলে দিলেন। তাঁর কাছেই এবার গদাধরের পড়াশুনা চলতে থাকলো। দাদাকে তিনি ভয় করতেন খুব। তাই যা হোক সামান্য একটু জ্ঞানবুদ্ধি তাঁর হলো।

গদাধর একদিন বললেন—"দাদা আমার লেখাপড়া আর হবে না।" দাদা জবাব দিলেন—"তবে কি তুই মূর্খ হয়ে থাকবি?"

লেখাপড়ার মন ছিল না বটে, কিন্তু তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। যা তিনি একবার শুনতেন—তা কখনও ভুলে যেতেন না। তিনি কথকথা শুনতে ভাল বাসতেন। আর যা যা তিনি শুনতেন—তাই আবার ঠিক সেইভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। কথকথার ভেতরের ভাবও তিনি গ্রহণ করতে পারতেন সহজেই। যা নাকি বড় বড় পণ্ডিতদেরও বুঝতে সময় লাগতো যথেষ্ট।

গদাধর ভালবাসতেন দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করতে, আর পুরাণ-কথা ও যাত্রা গান শুনতে। তাঁর হাতের তৈরী ঠাকুরের চেহারা হতো অতি চমৎকার। আর শুনে শুনে তিনি পুরাণ ইত্যাদির কাহিনী আর তাঁর ভিতরকার অর্থ বলতে পারতেন এমন, যা নাকি মহা মহা পণ্ডিতরা পর্যন্ত শুনে অবাক হয়ে যেতেন।

তাঁদের বসতবাটী ছিল জমিদার লাহাবাবুদের অধীন। জমিদার বাবুরা সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য গ্রামের এক পাশে একটা ধর্ম্মশালা তৈরী করে দিয়েছিলেন। বহু সাধু-সন্ন্যাসী তীর্থদর্শনে যাবার ও আসবার সময় এখানে বিশ্রাম করতেন। গদাধর সাধুদের খুব ভক্তি করতেন। তিনি ঐ পান্থশালায় গিয়ে সাধুদের মুখে বহু জ্ঞানের কথা শুনতেন। আবার চিন্তাকুল মনে ফিরে আসতেন বাড়ি।

এইভাবে তিনি সাধুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। এর পর কোন কোন দিন তিনি ছাইভস্ম মেখে তিলক কেটে বাড়ি ফিরতেন। গদাধরের মা-ও ছিলেন ধর্ম্মশীলা। তিনি পুত্রের হাতে সাধুদের জন্য প্রচুর খাবার দিয়ে পাঠাতেন।

বালক গদাধর এই সময় হতেই ভগবানের রূপ চিন্তা করতেন। তিনি একদিন আনুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালাক্ষীকে দেখতে যান। পথিমধ্যে তাঁর সংজ্ঞা লোপ পায়। এই হলো তাঁর দ্বিতীয়বারের ভাব-সমাধি।

গদাধর তাঁর বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীসাথীদের ভালবাসতেন খুব। তাঁর পিতার বন্ধু ধর্ম্মদাস লাহার ছেলে গয়াবিষ্ণু ছিলেন তার পরম বন্ধু। তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, খেলা করতেন, যখন যা খাবার পেতেন তাই আবার দু'জনে ভাগ না করে খেতেন না।

তাঁর কণ্ঠ ছিল অতি মধুর। তিনি গাইতেও পারতেন বেশ। পাড়ার

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাত্রার একটি দল গড়লেন। সেখানে তিনি যাত্রাগান করতেন, সকলে অবাক হয়ে দেখতো তাঁর অভিনয়।

উপনয়ন হবার পর তিনি ৺রঘুবীর বিগ্রহের পূজার অধিকার পেয়ে খুব খুসী হলেন। তিনি গৃহদেবতার পূজার ভার নিলেন নিজে। এবার তিনি তাঁর পূজায় কাটাতে থাকলেন বহু সময়। তিনি ভাবতেন—কিভাবে পূজা করলে ঠাকুর হবেন সন্তুষ্ট, তাঁদের অভাব-অভিযোগ যাবে দূরে, তিনি প্রাণে পাবেন প্রচুর শান্তি! তিনি একদিন শিবরাত্রিতে শিবের অভিনয়ে এমনই তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন যে, তাঁকে আর লোকে না মেনে পারলো না। তিনি হয়ে পড়লেন শিবময়। তাঁর বাহ্যজ্ঞান রহিত হলো।

তাঁর বড়দা রামকুমার ঠাকুর থাকতেন কলকাতায়, পূজা-পাঠ করতেন আর পাড়ার ছেলেদের সংস্কৃত পড়াতেন। তাঁর পূজা-পদ্ধতির খ্যাতি গিয়ে পৌঁছাল রাণী রাসমণির কানে।

তিনি খুঁজছিলেন একজন ভালো পূজারী। রামকুমারের সন্ধান পেয়ে তিনি তাঁকেই নির্ব্বাচন করলেন। নয় লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন ১২৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। ছোট ভাই গদাধরও দাদার সঙ্গে এখানে এলেন।

কত ছোটখাট ঘটনা ঘটে গেল তার পর। কয়েক বছর একে একে কেটে গেল। গদাধরের বয়স হলো ২৪ বৎসর। সংসারে নেই তাঁর মন। আপনার লোকেরা চাইলেন তাঁকে সংসারী করতে। বিয়ের হলো ঠিক।

পাঁচ বছরের মেয়ে সারদা দেবী।

হুগলী জেলার একটি গ্রাম জয়রামবাটী। এখানে সারদা দেবীর

পিতার বাড়ি। তিনি যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী। শুভদিনে বিয়ে হয়ে গেলো।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরকে পূজারী করবার জন্য পীড়াপীড়ি চললো। রাণী রাসমণির জামাই মথুরানাথ নাছোড়-বান্দা। তিনি ঠাকুরকেই পূজারী রাখবেন। তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরেই গদাধর তাঁর ভাগনে হৃদয়রামের ওপর আর সব দায়িত্ব দিয়ে—নিজে শুধু পূজার ভার নিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে মা ভবতারিণীর।

পূজায় বসলে তাঁর ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় কোথা দিয়ে তা তিনি বুঝতে পারেন না। ফুল-চন্দনেই শুধু তাঁর পূজা নয়। তিনি পূজার সময় মাঝে মাঝে গানও ধরেন—

আর ভুলালে ভুলবো না মা
দেখেছি তোর চরণ রাঙা—

এবার ঠাকুর হলেন মায়ের ছেলে। এখন তিনি আর পূজারী নন। তিনি তাঁর বাসনা মত মাকে ফুল দিয়ে সাজান, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মনে মনে হাসেন—আবার অভিমান করেন। আর কত কাঁদেন।

তাঁর ইচ্ছা জাগে মনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু মা তো তাঁর সাথে কথা বলেন না! পাষাণী মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ অবহেলা সহ্য হয় না ছেলের। মায়ের ছেলে তিনি, কিন্তু মা কই ছেলেকে তো হাসিমুখে কোন কথাই বলেন না!

একদিন ঠাকুর গেলেন রেগে। মাকে বললেন—কথা বলতে। মা শুনলেন না ছেলের কথা। দুঃখে তাঁর বুক গেল ফেটে। তিনি জীবনের শেষ করতে চাইলেন। লাফ দিয়ে মায়ের হাতের খাঁড়া পেড়ে নিজের মাথা কেটে ফেলার সংকল্প করলেন। যেই তিনি

লাফ দিয়ে খাঁড়া নিতে যাবেন, অমনি মা—ভক্তের মা—এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

এবার ঠাকুর অচেতন হয়ে পড়লেন মাটিতে। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে এলো না সেদিন। দিন কাটলো, রাত গেল—তবু তিনি অচেতন। পরদিন হলো তাঁর জ্ঞান।

এর মধ্যে কেউ কেউ খবর পাঠালেন কলকাতায় মথুরবাবুর কাছে। তিনি ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ওপর পরম তৃপ্ত হলেন তিনি। ঠাকুরের ওপর তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি হুকুম দিলেন কেউ যেন ঠাকুরের পূজোয় বাধার সৃষ্টি না করে।

রাণী রাসমণিও এলেন পূজো দেখেতে। ঠাকুরের পূজো দেখে তিনিও পেলেন পরম তৃপ্তি। তাঁর চোখ দিয়ে ভক্তিতে ঝরে পড়লো অশ্রু।

একদিন ঠাকুর পূজো করছেন, আর রাণী রাসমণি বসে আছেন মন্দিরে। কিন্তু তাঁর মনে জেগেছে তখন অন্য চিন্তা—সাংসারিক একটা মামলার কথা ভাবছেন তিনি বসে। ঠাকুর বুঝতে পারলেন তাঁর মনোভাব। তিনি গেলেন রেগে। রাগে এক চাপড় বসালেন রাণীমার পিঠে। বললেন—এখানে বসেও বিষয় ভাবনা ভাবছ?

রাসমণি তো অবাক! ঠাকুর কি করে জানলেন তাঁর মনের খবর। তিনি ঠাকুরের ওপর আরও ভক্তিমতী হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের গায়ের একটা বাগান। এখানে ফুটতো পূজোর ফুল। ঠাকুর একদিন সকালে ফুল তুলছেন—পূজো করবেন বলে। সাথে আছেন হৃদয়রাম—ঠাকুরের ভাগনে।

গংগার ঘাটে একখানা নৌকা এসে ভিড়লো। নৌকা থেকে নামলেন এক ভৈরবী। গেরুয়া-পরা, এলো চুল, কপালে সিঁদুর ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। হাতে তাঁর ত্রিশূল। যেন এক দেবীমূর্তি।

ঠাকুর ভৈরবীকে ডাকতে বললেন। হৃদয়রাম গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুর চিনতে পারলেন তাঁকে। তিনি জানতে পারলেন—তিনি দেবী। মথুরবাবু এক মস্ত বড় সভা ডাকলেন। দেশের পণ্ডিতেরা এলেন সভায়। এই সভায় ধর্ম্মকথা শুনালেন ভৈরবী। তিনি ঠাকুরকে মহাপুরুষ বলে প্রচার করলেন।

ভৈরবীর কথায় ঠাকুর সাধনা করতে থাকেন,—তান্ত্রিক সাধনা। তিন বছর ধ'রে তাঁর সাধনা চললো। তারপর তাঁর সাধনা শেষ হলো। তিনি মহাসাধক হয়ে দাঁড়ালেন। ভৈরবীও থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

আর একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন ঠাকুরের সামনে। এ সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁর নাম তোতাপুরি স্বামী। তিনি সাত শ' নাগা সন্ন্যাসীর প্রধান ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে বলিলেন—"তুমি বেদান্ত সাধনা কর।"

ঠাকুর তাঁর কাছে বেদান্তে জ্ঞান লাভ করলেন। ঠাকুরের ওপর সন্ন্যাসী ভারী সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে উপাধি দিলেন—পরমহংসদেব।

ঠাকুর ছিলেন ব্রহ্মচারী। তিনি বিয়ে করেও কখন ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট হননি। তিনি নারী মাত্রকেই মা-জ্ঞানে পূজা করতেন। সকল স্ত্রীলোকের মাঝেই তিনি মাকে দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন—"ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া কোন বড় কাজ কখনও করা যায় না।"

ঠাকুর বিদ্বান ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মুখের কথা শুনতে বহু পণ্ডিত, বহু দূর দেশ থেকে আসতেন তাঁর কাছে। তিনি শোনাতেন ছোট ছোট মিষ্টি কথা। তার মধ্যে থাকতো কত মধুর উপদেশ। অতি সাধারণ কথায়, অতি সাধারণ উপমায় তিনি বুঝিয়ে দিতেন জগতের কত জটিল প্রশ্ন, শাস্ত্রের জটিলতা।

কলকাতায় তখন বহু পণ্ডিত, বড়লোক, গুণী ও জ্ঞানী বাস করতেন। তাঁরা যেতেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে শুনতেন তাঁর কথা। তাঁরা হলেন ঠাকুরের শিষ্য। তিনি যা যা বল্‌তেন তা তাঁরা অবনত মস্তকে মেনে নিতেন। ঠাকুরের কথার ওপর তাঁদের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না একটুও। তাঁরা মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন তাঁর মুখের কথা শুনে, সাপ যেমন চুপ করে থাকে বাঁশীর শব্দ পেয়ে।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কত বড় বড় লোক তাঁর কাছে যেতেন তাঁর মুখের মধুর বাণী শুনতে। এঁরা এবং আরও অনেকে ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত। তিনি ঠাকুরের 'কথামৃত' রচনা করেন। এ এক উপাদেয় গ্রন্থ।

তাঁর গুণী ভক্তদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরের কথা ও বাণী ছড়াতে লাগলেন তাঁর পত্রিকায়। বাংলায় তাঁর কাগজ ছিল 'সুসমাচার' আর ইংরাজিতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার'।

ঠাকুরের গুণের কথা সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়লো হু হু করে। ঠাকুরের বিচিত্র কাহিনী পাঠ করে দলে দলে লোকজন ছুটে আসতে লাগলেন তাঁকে দেখতে, তাঁর মুখের কথা শুনতে, তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে ধন্য হতে।

সংসারে থেকেও ঠাকুরের পরম ভক্ত হলেন দু'জন। তাঁরা রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র। একে একে ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চললো। একটি ছোট ছেলে, তাঁর নাম যোগীন্দ্রনাথ—হলেন তাঁর পরম ভক্ত। এই ছোট ছেলেটি শেষে হলেন স্বামী যোগানন্দ।

রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কাজ করতো লাটু। তাঁর সখ হলো ঠাকুরকে দেখার। কিন্তু সে ঠাকুরের কাছে যাবে কি করে? তোমরা

জান ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। সে কলকাতা থেকে হাঁটতে সুরু করলে গিয়ে পোঁছালো পায়ে হেঁটে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাকে থাকার ঠাঁই দিলেন। তাকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলেন বহু। কিন্তু হলো না তার কিছু। কিন্তু এই লাটুই হয়েছিলেন পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ, ঠাকুরের অসীম কৃপায়। 'লাটু মহারাজ' বলেই তাঁকে সকলে জানতো।

বড় লোকের এক ছেলে—রাখাল। তিনি সংসার ছেড়ে দিলেন। ঠাকুরেব স্নেহের পাত্র হয়ে পড়লেন তিনি। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর চললো—খেলা, যোগ, পূজা সব কিছু। তিনি হলেন ঠাকুরের আসল পুত্র। আর এই রাখালই পরে হয়েছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, 'রাখাল মহারাজ'।

নারী ভক্তও জুটেছিল তাঁর প্রচুর। তিনি তাঁদের মায়ের মত ভক্তির চোখে দেখতেন।

একে একে সব রকম লোক হলেন ঠাকুরের ভক্ত। তাদের মধ্যে ছিল যেমন ধনী তেমনি নির্ধন ; যেমন গুণী তেমনি নির্গুণ ; যেমন আস্তিক তেমন নাস্তিক। কিন্তু ঠাকুর সবাইকেই দিলেন প্রেম। ঠাকুরের পাদস্পর্শে সবাই হলেন সোনা। কাউকেই তিনি পৃথক করে দেখলেন না। কারণ তাঁর কাছে তখন আর ছোট-বড় ভেদ ছিল না।

দিনে দিনে তাঁর নাম কাগজের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দেশ-বিদেশে। দলে দলে কত শত নর নারী ও পুরুষ ছুটে এলো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখবে বলে। সকাল সন্ধ্যা, দিনরাত্রি সব সময় লোকের ভিড়, এ ভিড়, আর কমলো না।

মধ্য-কলিকাতায় সিমলা অঞ্চলে দত্তদের বাড়ীর আদব-কায়দা সবই বিলেতী ধরণের। এই বাড়ীর একটি ছেলে নাম

তাঁর নরেন। কলেজে পড়েন ; পুরোপুরি পাশ্চাত্য ভাবেই গড়ে উঠেছেন। তবে গলাটা তাঁর ভারী মিষ্টি ; গান গাইতেও পারতেন চমৎকার।

একদিন ঠাকুর কলকাতায় তাঁদের পাড়ায় মিত্রবাড়ী এলেন— তাঁর এক ভক্তের বাড়ী। পাড়ার লোকে ঠাকুরকে গান শুনাতে ডাকলেন নরেনকে। নরেন এলো, গানও হলো।

গান শুনে ঠাকুর আকৃষ্ট হলেন নরেনের প্রতি। পরিচয় হলো উভয়ের মধ্যে। ঠাকুর বোধ হয় যুবকের মধ্যে পেলেন অস্বাভাবিক কিছু। যুবক সপ্রতিভ। লজ্জাসরম বা ভয়-ডরের কিছু নেই তাঁর মধ্যে।

একদিন এই যুবক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঠাকুর, ভগবানকে আপনি দেখেছেন কি ?"

সিদ্ধপুরুষ ঠাকুর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"দেখেছি বই কি ! যারা দেখতে চায় তারা দেখতে পায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, তাঁকে দেখা যায় ; তাঁর সাথে খেলা করা যায়। কিন্তু যুবক, তাঁকে তো সবাই দেখতে চায় না। তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও ?"

যুবক অবাক। অনেকের কাছে অনেকদিন যুবক এভাবের প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু এমন উত্তর তো কেউ দেয় নি ! এ ঠাকুর তো সাধারণ নন। যুবকের মন কিছুটা নরম হলো—ঠাকুরের উপর শ্রদ্ধা এলো। তিনি প্রণাম করলেন ঠাকুরের চরণে।

ঠাকুর তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"তোমাকে আমি দেখাব আমার মাকে। তিনিও দেখা দেবেন তাঁর ছেলেকে।'

তার পর ঠাকুর চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে মায়ের কাছে। আর নরেন গেলেন বাড়ি। তাঁর মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এলো। তিনি মাঝে মাঝে যেতে আরম্ভ করলেন দক্ষিণেশ্বরে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণের আগে নরেনকে দীক্ষা দিলেন। আশীর্ব্বাদ করে বললেন—"এ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে সারা জগতে প্রচার করতে।" তাঁর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে নরেন গেলেন জগতের সকল জাতের দেশে। জগতের কাছে প্রচার করলেন হিন্দুধর্ম্ম। কত নরনারী হলেন তাঁর শিষ্য। কতজন হলেন তাঁর গুণে মুগ্ধ। এই নরেনই হলেন পরে স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক। এঁর নাম নিশ্চয় তোমরা জান।

বহুজনের আসা যাওয়ার ফলে বিশ্রাম ছিল না ঠাকুরের এক মুহূর্ত্তও। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার হলো অসুখ। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ির অবস্থা তখন হলো খুব খারাপ। ঠাকুরকে চিকিৎসা করতে আনা হল কলকাতায়।

শ্যামবাজারে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে। তিনি যে বাড়ীতে থাকতেন সে বাড়ী এখনও আছে।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁকে চিকিৎসা করলেন। কিন্তু রোগের উপশম হলো না। দিন দিন শরীরের অবস্থা হয়ে উঠলো খুব খারাপ।

তাঁর মুখের ঘা কিছুতেই আর সারলো না।

তাঁকে এবার নিয়ে যাওয়া হলো কামারপুকুর। এখানেও ভক্ত ও ডাক্তারের সেবায় ও চিকিৎসায় কোনই ফল হলো না। তিনি জানালেন মার কাজ শেষ হয়েছে।

একদিন নরেনকে ডাকলেন কাছে। তাঁকে তিনি ভালবাসতেন খুব। নরেন কাছে গেলেন, তাঁকে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন—"দেশ-জোড়া তোমার নাম হোক। তুমি মায়ের মহিমা প্রচার কর জগতের বুকে।" ঠাকুর তাঁর শক্তি দান করলেন তাঁকে। নরেন্দ্রনাথ অসীম শক্তিলাভ করলেন।

তারপর ঠাকুর দেহরক্ষা করলেন—ভক্তদের চোখের জলে ভাসিয়ে তিনি মায়ের সংগে এক হয়ে গেলেন। সে ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর হলেন সমাধিস্থ। এ সমাধি তাঁর আর ভাঙ্গলো না। তাঁর প্রাণ দেহ থেকে চলে গেল। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে গেলেন।

এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল বাহান্ন বছর। কাশীপুরের বাগানবাড়িতে দেহ রাখলেন।

এরপর তাঁর শিষ্যেরা জমা হলেন একখানা ভাঙ্গা বাড়িতে, সেটা বরাহনগরে। এখানেই তাঁরা খসড়া করলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর। শিক্ষিত বারটি ছেলে আর বাড়ি ফিরলেন না। তাঁরা ঠাকুরের কথা মত কাজ করবেন বলে ঠিক করলেন। তখন তাঁদের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। কোনদিন কিছু খেয়ে, কোন দিন না খেয়ে, কোনদিন বা একবেলা খেয়ে তাঁরা ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয় হলো। কোন কোন দিন তাঁদের কেটেছে তেলাকচুর পাতা, ভাতে ভাত, তাও মানকচুর পাতায় রেখে!

ঠাকুরের উদ্দেশ করে তাঁরা নিবেদন করতেন দু' একখানা নৈবেদ্য। শুধু চাল থাকতো তাতে—আর কিছু না। তবু তাঁরা মুখে গেয়ে যেতেন ঠাকুরের যশোগান। লোকে বাইরে থেকে কীর্ত্তনে মুগ্ধ হয়ে, পথে যেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো, আর তাদের মন ভক্তিরসে গলে যেত। তারপর একে একে তাঁদের মিশনে জমতে লাগলো দু' একজন করে ভক্ত। তাঁদের সাহায্যে ধীরে ধীরে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হতে থাকলো।

কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ভারতে স্থাপন করলো তিনটি মঠ—একটি বেলুড়ে, একটি মাদ্রাজে আর একটি মায়াবাড়িতে।

কলিকাতার উত্তরে বেলুড় গ্রাম। গংগার তীরে এখানে স্থাপিত হলো মঠ। সে ১৩০৪ সালের কথা। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থি, পাদুকা, হাতের লেখা প্রভৃতি অনেক জিনিষ সযত্নে রাখা হয়েছে।

সেদিন থেকে এখানে প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ করে শিবরাত্রির পর মহোৎসব হয়। এই উৎসবে নানা দেশের বহু গুণী ব্যক্তিরা এসে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয় ঠাকুরের কথা ও কথামৃত।

এই মঠে পূজা হয়। এখানে থেকে বহু গরীব ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন; এখন এখানে একটি কলেজ হয়েছে।

বেলুড়মঠে যে যে উৎসব হয় যখন, ঠিক সেই ভাবেই সকল পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব সবই মায়াবতীর মঠে ও মাদ্রাজের সমুদ্রের ধারের মঠেও প্রতিপালিত হয়।

পরমহংসদেবের মহৎ চরিত্রকে আদর্শ করে কত ছেলে মানুষ হয়েছে তা কে জানে। সংসারে থেকেও যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তা তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করে গেছেন। এই সেদিন মাত্র—৬৪ বছর আগে।

তাঁর অসংখ্য উপদেশের মধ্যে—এখানে তোমাদের কয়েকটি বলছি। এই উপদেশগুলি তোমরা জীবনে পালন করো—তোমাদের কল্যাণই হবে।

পরমপুরুষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

[১] এক ডুবে রত্ন না পেলে, রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। ধৈর্য্য ধারণ কর, সময়ে ঈশ্বরের কৃপা হবে।

[২] সংসারে থেকে সব কাজ কর। দৃষ্টি রেখো কিন্তু তাঁর পথে। যেমন মা সন্তানকে কোলে করে ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটছেন। সন্তান কাঁদছে, তাকে মাই দিচ্ছেন; আবার হাতে ঢেকির শলা না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য আছে।

[৩] চুষিকাটি ফেলে মা বলে কাঁদলে—মা আসেন ছেলের কাছে-দৌড়ে। আকুল হয়ে ডাকলে ভগবানও খুব তাড়াতাড়ি আসেন।

[৪] বৃথা তর্কে কোন ফল হয় না—তাঁর কৃপা হলে সবাই স্ব স্ব ভুল বুঝতে পারে।

[৫] গেরুয়া পরিধান করলে সহজে মনে সাধনার উপযোগী ভাব আসে।

[৬] ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, বাঘের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়া উচিত নয়, সে রকম কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। স্ত্রী-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

[৭] পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা ভালো।

[৮] যে বিদ্যালাভ করলে তাঁকে জানা যায়—তাই বিদ্যা; আর সব মিথ্যা।

[৯] যেমন পুঁজি, তেমনি দর।

[১০] কূপের ব্যাঙ নিজের কুয়াটাকেই জানে।

[১১] ঈশ্বর এক বই দুই নাই। ভিন্ন ভিন্ন লোক, ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। কেউ বলে গড্, কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে জোব, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে শিব, দুর্গা, কালী,—বস্তু এক, নাম আলাদা। যেমন, জল, এই একই বস্তুকে—ভিন্ন, ভিন্ন দেশের লোকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে।

[১২] ধর্ম্মকথা বলা সোজা, কাজে করা কঠিন।

[১৩] ভগবানের নাম ও চিন্তা যে রকম করেই করনা কেন, তাতেই কল্যাণ হবে।

[১৪] সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ-মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না।

[১৫] ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে।

[১৬] সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই, সকলের সহ্যগুণ থাকা চাই।

[১৭] সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবান লাভ হয়।



মূল্য আট আনা মাত্র